অধ্যায় ১২ : সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন

বিন্যাসক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ চিত্রনাট্য ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের তুলনা
১২.৪ নাটকের চলচ্চিত্রায়ন
১২.৫ কথাসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন
১২.৬ সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষা
১২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.৯ অতিরিক্ত পঠন
১২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- চিত্রনাট্য নির্মাণের পেছনে সাহিত্যের ভূমিকা বিষয়ে জানতে পারবেন।
- কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা কীকরে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসাবে নির্মিত হয় তা শিখতে পারবেন।
- সাহিত্যে ভাষা ও চলচ্চিত্রের ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করে তা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারবেন।

১২.২ পরিচিতি

চলচ্চিত্র ভালোবাসেনি এমন মানুষ অন্তত এই আধুনিক কালে খুব একটা খুঁজে পাওয়া ভার। যদিও গণের বিচারে হয়তো চলচ্চিত্রের ভালো মন্দ বিচার করা নিতান্তই বোকামি। এর কারণ আজকাল বেশিরভাগ দর্শকেরই টান উত্তেজনামূলক চটকদার চলচ্চিত্রের প্রতি। কিন্তু এই বহু বিচারে কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রাণভোমরাটি লুকিয়ে নেই, বরং চলচ্চিত্রের মূল আবেদন লুকিয়ে থাকে সাহিত্যাশ্রিত চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলীতে। তাই সাহিত্যশ্রিত চলচ্চিত্রের প্রসিদ্ধি যুগে যুগে কালে কালে। বাংলা চলচ্চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট একটি ব্যকরণ বর্তমান। আলোচ্য অধ্যায়ে আমাদের অধ্যয়ন চলচ্চিত্রের এই দিকটির দিকেই।

১২.৩ চিত্রনাট্য ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের তুলনা

মানুষের বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি হচ্ছে চলচ্চিত্র, ঠিক যেমন বিস্ময়কর নির্মাণ সাহিত্য। সাহিত্য যেমন সমাজের চরিত্ররূপকে প্রতিবিম্বিত করে চলচ্চিত্রও তেমনি সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আর এর অন্যতম কারণ বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের আশ্রয় কিন্তু সামগ্রিক মানবিক আবেগ-অনুভূতি। সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন বা ভাব কিন্তু মিলন, এই মিলন সাহিত্যিকের মনন ও চিন্তনের সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের, শব্দের সঙ্গে অর্থের। অন্যদিকে 'চলচ্চিত্র' কথার অর্থ চলমান চিত্র অর্থাৎ গতিশীল ছবি। ইংরাজিতে যাকে বলা হয়েছে 'সিনেমা'। এই 'সিনেমা র আবার এসেছে গ্রিক শব্দ' বিশ্ব চলচ্চিত্রের যখন জন্ম, তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের বয়স ২৫ বছর। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে তিনি ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' দেখান তৎকালীন বোম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমা হলে। অন্যদিকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের বাংলার কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তি পায় বাংলা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবি 'বিল্ব্ মঙ্গল'। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত দুটি চলচ্চিত্রই কিন্তু সাহিত্যাশ্রিত, অর্থাৎ বলার কথা এই যে ভারতীয় সিনেমার জন্মলগ্ন থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে তার গভীর যোগসূত্র। সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই নিবিড় সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন লিখেছেন- "The connections that exist between litareture and flim are worth concentrating upon first and most simply because litareture and flim are near neighbours in many respects and secondly because these two forms of artistic expression appear to be in creasingly dominant in the formation of aesthetic responses." (Richerdson, Robert; Literature and Flim; P-12) তবে এক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সাহিত্য একক শিল্প আর চলচ্চিত্র হল যৌথ শিল্প। এ সত্ত্বেও চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত নিবিড়।

বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই সাহিত্য আশ্রয় আরো গভীর ভাবে চিহ্নিত। যার ফলে সবাক যুগের সিনেমার সঙ্গেও সাহিত্যের সম্পর্ক গোঁড়া থেকেই দৃঢ় হতে শুরু করে। এর একটি অবশ্য বিশেষ কারণ বর্তমান আর তা হল এসময় প্রায় বিখ্যাত ও কৃতি সাহিত্যিকেরাই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখতেন। পরবর্তী কালে বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এমনকি বোম্বের বড় বড় পরিচালক বাংলার এই সকল প্রখ্যাত সাহিত্যিক যথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের কাহিনির চলচ্চিত্র রূপ দেন। তাই সাহিত্যের অনেক কাল পরে সিনেমার জন্ম হলেও, এই দুটি শিল্প মাধ্যম পরস্পরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাহিত্য ও সিনেমা যুগে যুগে মানুষের প্রিয় হয়েছে, তার কারণ সাহিত্য ও সিনেমার মুখ্য অবলম্বন মানুষ, তার মন ও তার সামাজিকতা। অর্থাৎ সমকালীন দেশ ও জীবনের বিশ্বস্ত দর্পন হয়ে উঠেছে এই দুটি বিশেষ শিল্প মাধ্যম। যার ফলে সিনেমার সামাজিকতা কোথাও না কোথাও বাঁধা পড়েছে সাহিত্যের সামাজিকতার সঙ্গে, আর যেখান থেকে দর্শক-পাঠক খুঁজে পেয়েছে এক বিশেষ 'মানবীয় রস'।

চিত্রনাট্যের গঠন যতই জটিল হোক না কেন একথা সত্য যে এর যোগ সর্বাগ্রে সাহিত্যের সঙ্গেই। চলচ্চিত্রের নিত্যনতুন আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও সাহিত্যের উপরেই এর প্রাথমিক নির্ভরতা। সাহিত্য মূলত দু-ভাগে বিভক্ত এক কাব্য সাহিত্য দুই গদ্য সাহিত্য। গদ্য সাহিত্য আবার নাটক (যদিও অনেকে বলবেন নাটকেও কাব্যসাহিত্যের গুণ বর্তমান), কথাসাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য, কল্পকাহিনি ইত্যাদিতে এবং কাব্যসাহিত্য গীতিকবিতা, ব্যালাড, ওড ইত্যাদিতে বিন্যস্ত। সে যাহোক চলচ্চিত্র যতই কল্পচিত্র হোক না কেন তা মূলত কিন্তু সাহিত্যের এ সকল ধারা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। যেমন গল্পের কাছ থেকে সে পায় নানান ধরণের বিষয়বস্তু, জীবনকে দেখার সংক্ষিপ্ততম দৃষ্টিকোণ বা সিচুয়েশন। উপন্যাস তাকে দেয় এক বিশেষ থীম, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কাহিনির বহুমুখিতা। আর কবিতা তাকে সমৃদ্ধ করে ব্যক্তির অন্তর্গত উচ্ছ্বাস, কাব্যিকতা, সীমার সঙ্গে অসীমের যোগে। তবে একটি কথা মনে রাখার বিষয় কেবল বিশুদ্ধ কবিতায় চলচ্চিত্রের চাহিদা মেটে না। অন্যদিকে নাটক চলচ্চিত্রকে দেয় দ্বন্দ্ব বা সংঘাত যা হয়তো নাটকের মতো চলচ্চিত্রেরও মূল।

তবে এখানে একটি কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগ যতই নিবিড় হোক না কেন, এ দুটি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র তার উপাদান সংগ্রহ করলেও চলচ্চিত্র নির্মাতা কিন্তু তাকে আপন ব্যাকরণের ছাঁচে ঢেলে এক নতুন রূপে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। আসলে একটি গল্পের হুবহু ভিস্যুয়ালাইজেশেনই কিন্তু চলচ্চিত্র নয়। অর্থাৎ একজন চিত্রনাট্যকার যখন আপন কৃতিত্বের বলে গল্পটির যথার্থ রদ বদল ঘটিয়ে তার গায়ে ভিস্যুয়াল হওয়ার বৈশিষ্ট্য আটবেন তখন সে চলচ্চিত্র হওয়ার অবকাশ পায়। তাই ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের সঙ্গে পরিচালক পুদোভকিন করা 'মাদার' চলচ্চিত্রে এই ভিস্যুয়াল হওয়ার সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। এতসব সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে সার্থক ও উচ্চকোটির চলচ্চিত্র কখনোই সাহিত্যবোধ বর্জিত নয়। এ পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচক পূর্ণেন্দু পত্রী জানান, "সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। প্রায়শই নিবিড় মিলন। কিন্তু মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ, বিরহ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধনে রাঙা রাখী ছিঁড়ে যায় অনতিবিলম্বে। আবার সব চলচ্চিত্রই যে সাহিত্যের গা-ভরা যৌবন, সৌন্দর্য সুষমা, কিছুই টলাতে পারে না তাদের একাগ্র, একান্ত তপস্যাকে। আবার কোনও কোনও চলচ্চিত্র অবিবাহিত ঠিকই কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে গোপন প্রেমের লুকোচুরি খেলাটা থেমে নেই। কোনও কোনও স্বামী আছেন যাঁরা ওঠেন এবং বসেন স্ত্রীর বাক্যে। কোনও কোনও স্বামী নিজের মনের মাপে বদলে নেন স্ত্রীকে। চলচ্চিত্রও তাই। কোনও কোনও চলচ্চিত্র সাহিত্যের ক্রীতদাস। কোনও কোনও চলচ্চিত্র সাহিত্যকে নিঙরে, ক্ষীরটুকু নেয় ছেঁকে দুধটুকু দেয় ফেলে।"[১১] সুতরাং সমালোচকের এই উক্তি থেকে এই কথা স্পষ্ট যে শিল্পের এই দুটি শাখার যেমন যোগ রয়েছে তেমনি এদের নিজস্বতাও রয়েছে। আর নিজেস্বতা হারিয়ে যেকোনো শাখাই যখন অপরে মিশে যায় বা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে তখন কিন্তু উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। চিত্রনাট্য ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের তুলনা সংক্ষেপে তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৪ নাটকের চলচ্চিত্রায়ন

নাটক ও চিত্রনাট্য বৈশিষ্ট্যগত ভাবে খুব কাছাকাছি দুটি সাহিত্যিক উপাদান। দুটিরই যোগ অভিনয়ের সঙ্গে। তবে একথা স্বীকার্য যে নাটকের কাছ থেকেই কিন্তু চিত্রনাট্য অভিনয়ের আঙ্গিকগত শিক্ষা নেয়। তবুও বলতে হয় দুটির সম্পর্ক ও চিত্রনাট্যের উপর নাটকের শিল্পগত প্রভাব আরও ব্যাপক ও গভীর। নাটক ও চলচ্চিত্র উভয়ের মধ্যেই মানুষের জীবন ও সময় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই চিত্রনাট্য ও নাটক উভয়ের মধ্যেই রয়েছে প্রত্যক্ষতা, সক্রিয়তা, নাটকীয়তা, তাৎক্ষণিকতা ও আবেগগত অভিঘাত। আর উভয়ের প্রধান লক্ষণ ঘটমানতা। সিনেমার প্রথম দিন থেকেই তত্ত্ব ও প্রয়োগগত ভাবে তার উপর অন্যতম প্রভাব কিন্তু নাটকের। উৎপল দত্তের সিনেমার বহু কিছুই কিন্তু গৃহীত হয়েছে নাটক থেকে কিংবা আইজেনস্টাইন ও পুডভকিনের মনতাজ সম্পর্কিত আলোচনার অসংখ্য উদাহরণ ও বিশ্লেষণ সরাসরি নাটক থেকেই গৃহীত।

এতসব সত্ত্বেও নাটক ও চিত্রনাট্যের কিছু সুক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। মনে রাখতে হবে নাটক লেখা হয় মঞ্চ অভিনয়ের জন্য, ফলত নাটকের সঙ্গে দর্শকের একটি সরাসরি যোগাযোগ বর্তমান। দর্শকের সঙ্গে এই সরাসরি সম্পর্ক কিন্তু চিত্রনাট্যে অনুপস্থিত। এখানে সে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ক্যামেরার মাধ্যমে। অনেকটা অন্যের জবানীতে কোন নাটকীয় ঘটনার বিবরণ শোনার মতো। তাই পুরো ব্যাপারটি এমন হয়ে যায় যে, পরিচালক তার আজ্ঞাধীন ক্যামেরার সাহায্যে গল্পটি কীভাবে পরিবেশন করে শিল্পরস সঞ্চার করেছেন। এই ব্যাপারটি প্রথম অনুধাবন করেছিলেন অসমান্য প্রতিভাসম্পন্ন মার্কিন পরিচালক ডি. ডব্লিউ গ্রিফিথ। জর্জ মেলিয়েস যেভাবে চিত্রনাট্য রচনা করলেন গ্রিফিথ তার সঙ্গে যুক্ত করলেন ক্যামেরার নানান ধরনের শট ও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন, দৃশ্যবস্তুর সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষন, আলোক সম্পাতের নাটকীয় বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তুর বিরাট প্রসার ও গুরুত্ব। গ্রিফিথ গল্প বলার প্রয়োজনে ক্যামেরার শটের খেলা, আলোছায়ার খেলা ও সর্বোপরি সম্পাদনার জাদু জুড়ে দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রে এক মায়াবী প্রাণের সূচনা করলেন।

ফরাসি পরিচালক রেনেক্লেয়ারই প্রথম চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োগ নিয়ে ভাবেন। তিনি সংলাপের চেয়ে চিত্রের উপর বেশী জোর দেন। তাঁর মতে চলচ্চিত্রকে ফিতা-বন্দী নাটক করে রাখাটা ঠিক নয়। এই ধারণা থেকে নির্মাণ করেন 'Sous les toits de paris (1929), 'Le millien' (1931), এবং 'Anous la libarte' (1931) প্রভৃতি সিনেমাগুলি। তিনি এই চলচ্চিত্রগুলোতে খুব কম সংলাপ, কম সংগীত ব্যবহার করেছিলেন এই জন্য যাতে তাঁর চলচ্চিত্রে যে দৃশ্যের সমাহার আছে সেগুলিকে জীবন্ত করে তোলা যায়। তিনি বলেছিলেন- "Talkie is no longer photographed theatre. It is now flim.

Sound flim." (Bell, Monta; Movies and Talkies; P-431) তাঁর মতে শব্দ নয়, ইমেজ-ই পর্দাকে জীবন্ত করে তোলে। শব্দ ইমেজকে জীবন্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে একটি কথা পরিস্কার যে চিত্রনাট্য কেবল চরিত্রায়ণ নয় তা কতগুলো সফল ইমেজের সাক্ষাৎ উপস্থাপন আর নাটক সেদিক থেকে চরিত্রায়ন নির্ভর। কারণ চলচ্চিত্র হবে সম্পূর্ণ দৃশ্য নির্ভর তাই একজন চিত্রনাট্যকার এই দৃশ্যের অগ্রাধিকারের কথা মাথায় রেখে চিত্রনাট্য লিখতে বসবেন। তাঁর রচিত সংলাপ কেবল কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে অ্যারিস্টটল প্লটকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বললেও নাটক কিন্তু সংলাপ নির্ভর। যেখানে সংলাপের মধ্য দিয়েই সামগ্রিক গল্প বলবে চরিত্রগুলো। তাঁর উপর যেহেতু নাটক মঞ্চের আঙ্গিকে রচিত তাই নাট্যকারেরা সংলাপকে গুরুত্ব দিয়ে রচনা করতেন।

অন্যদিকে নাটকের মতো স্থান-কাল প্রকাশে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা চিত্রনাট্যে তেমন দেখা যায় না। এমনকি নাট্য পরিমণ্ডল ও চরিত্রের অন্তস্থিত ভাবনাকে বোঝানোর জন্য নাটকে যে বর্ণনাত্মক সংলাপের সংযোজন করা হয় চিত্রনাট্যকার তা নিসংকোচে এড়িয়ে যেতেই পারেন। কারণ তিনি তাঁর চিত্রনাট্যে সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি বোঝাতে যে ক্যামেরার শট উল্লেখ করবেন তাতেই নাটকের এই বৃহৎ আয়োজন সম্পাদিত হয়ে যায়। এতসব সত্ত্বেও নাটক ও চিত্রনাট্য উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রসমূহের আন্তঃসম্পর্ক জানতে সংলাপই একমাত্র ও প্রধান আশ্রয়।

এবার আসি চরিত্রের কথায়। শেক্সপিয়ার নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। তাই নাটকে চরিত্রগুলির পরিবর্তন খুব ধীরে ঘটে কিংবা অনেক নাটকে চরিত্রগুলি প্রায় একই রূপে সমগ্র নাটক জুড়ে অবস্থান করে। কিন্তু চলচ্চিত্র যেহেতু ফাস্ট মিডিয়া তাই এর চরিত্রগুলি পরিবর্তন খুব দ্রুত। তাই 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপুর কিংবা আনন্দের সঙ্গে সিনেমার অপু বা আনন্দকে মেলানো যায় না।

নাটকের পাণ্ডুলিপিকে চলচ্চিত্র রূপ দিতে গেলে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল সংলাপ। নাটকে স্বভাবতই বর্ণনার চেয়ে সংলাপের আধিক্য থাকে বেশি। অপরদিকে চিত্রনাট্যে অধিক সংলাপ ব্যবহার কখনোই কাম্য নয় উপরন্তু তা চলচ্চিত্রের গুণকে হ্রাস করে। নাটকে সংলাপ হয়ে ওঠে নাট্য ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। চলচ্চিত্রে এই ভাব প্রকাশিত হয় ক্যামেরার জাদুকরী বিদ্যাতে, যথা রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি ভাবসমূহের প্রকাশ যেমন নাটকে হয় সংলাপকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্রে তাই ক্যামেরার নৈকটিক শট, প্রতিক্রিয়া বহুল শট, দৃষ্টিকোণ-সম্পর্কিত শট দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার সার্থক ব্যাকরণ চিত্রনাট্যে উল্লেখ থাকে। এতসব সত্ত্বেও নাটক ও চলচ্চিত্রের পাণ্ডুলিপি বা চিত্রনাট্য কিন্তু একই ঘরানার। এই দুইয়ে এক ঠাস বুনন থাকে, থাকে আবহমানকাল সময়ের আভাস। যদিও চিত্রনাট্য সিনেমা হয়ে যাওয়ার পর এই সময়ের সংকেত বদলে যেতে পারে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। নাটকের চলচ্চিত্রায়ন রূপটি ব্যাখ্যা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৫ কথাসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন

সাধারণত গল্প, উপন্যাস ও নাটক সাহিত্যের এই তিন বিশেষ উপাদানের বিশেষ নির্ভরতায় যুগে যুগে চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। আর এজন্য হয়তো আজও সিনেমাকে বাংলায় 'বই' বলে অভিহিত করা হয়। বাংলা ছবির আদিতে চিত্রনাট্যর মূল উপাদান ছিল পুরাণ কিংবা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের গল্প-উপন্যাস। হলিউড প্রভাবমুক্ত সেসকল সিনেমার বাংলা কথাসাহিত্য অবলম্বন ও প্রয়োগ এতে দুর্বল ছিল যে একসময় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখে মনে করেছিলেন যে উপন্যাস থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে ম্যাডান কোম্পানি যতগুলি ফিল্ম তৈরি করেছেন সবগুলিই সিনারিও-র দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। ফিল্মের জন্য নতুন ও তদনুযায়ী সাহিত্যই রচিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। কারণ পর্দা ও পুথির পাতা এক নয়। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের শেষ থেকে বাংলা ছবির চিত্রনাট্য একটু একটু করে সংহত হতে শুরু করে। শিথিলতাও কিছু কম দেখা গেল। শুরু হল নিউ থিয়েটার্স যুগ। চিত্রত্রনাট্য রচনা যে প্রয়োজন তার টের পেতে থাকলেন পরিচালকেরা। শুরু হল কথাসাহিত্যের কাহিনি থেকে নতুন ভাবে চিত্রনাট্য রচনার কাজ। নতুন এই সকল চিত্রনাট্যকারেরা গল্প-উপন্যাস থেকে কাহিনিচিত্র পায় ও নেয় থিম ও থিমেটিক দৃষ্টিকোণ, চরিত্র মনস্তত্ত্ব এবং উপন্যাসের কাহিনি ও বক্তব্যের যে বহুমুখীতা থাকে তা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ফলপ্রদ হয়ে ওঠে।

সত্যজিৎ রায় থেকে বাংলা ছবির চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব মূলত পরিচালকেরাই নিতে শুরু করেন। কিন্তু চার ও পাঁচের দশকে চেহারাটা অন্যরকম ছিল। পেশাদার চিত্রনাট্যকার হিসাবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় খ্যাতি অর্জন করেন। সে-সময়ের কথাসাহিত্যিকেরাও তাঁদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে চিত্রনাট্য রচনায় এগিয়ে আসেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমূঘ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দি ও বাংলা ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর প্রমুখও এই কাজে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বাংলা সিনেমার চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনার কাজে যুক্ত হয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিতের মতো বিখ্যাত কথাসাহিত্যিকেরা।

কথাসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়নের ক্ষেত্রেও নির্মাতাকে কথাসাহিত্যের আঙ্গিক ও রূপগত পরিবর্তন করতে হয়। মনোরম উপস্থাপনে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে কখনও এর প্রকাশে, কখনও পরিমণ্ডল সৃজনে আবার কখনও নতুন ও ভিন্নতর চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে। কথাসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তবে যেসকল উপন্যাস কোনো প্রকরণ অনুবর্তী হয়ে রচিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রায়নের বিশেষ কিছু সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। তাই সমালোচকেরা মনে করেন

উপন্যাসের প্রকরণের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রকরণের সাদৃশ্য কাম্য। প্রকরণ অনুগ হলে রূপান্তর সহজ হয়ে ওঠে। তবে উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের ক্ষেত্রে কখনো মূল লেখকের শিল্পদর্শন বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত'র ভাবনা আর সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'র ভাবনা কখনো সমগোত্রীয় নয়। এক্ষেত্রে মূল শিল্পরূপের নবতর এমনকি ভিন্নতর ব্যাখ্যা সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। আবার কখনও মূল শিল্পদর্শনের অনুগ বৈচিত্র্যের বার্তাবাহী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব এমনিতে সংঘটিত হয় না। স্থান-কাল-পাত্র এই ত্রিবিধ সাংস্কৃতিক বৃত্তকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন ধরা যাক মধ্যপ্রাচ্যের কোন গল্পকে আশ্রয় করে যদি কোনো চিত্রনাট্যকার বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চান, তবে তার কাহিনি অবয়ব বাংলা সংস্কৃতির আধারে বদলে যেতে বাধ্য। আর এই রূপান্তর নতুন এক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত বহন করে।

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয় তার কাহিনি নির্মাণকে। আদতে চিত্রনাট্য রূপান্তরের সময় উপন্যাসে চিত্রিত চরিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রের চরিত্রের বহুমুখী পার্থক্য হতে পারে। আর এই পরিবর্তিত চরিত্রসমূহের মানসিক জটিলতার স্বরূপ চলচ্চিত্রে বাস্তবমুখী করে তুলতে সাহায্য করে কিংবা বলা ভালো চরিত্রায়নের প্রয়োজনে বদলে যায় কাহিনি শৈলী। তবে এই রূপান্তর দুটি একেবারে ভিন্ন সংস্কৃতির উপকরণ করে করা সম্ভব নয়, আর করা হলেও তা যথার্থ শিল্পোন্নত হয়ে উঠবে না বলে সমালোচকেরা মনে করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রের রূপান্তরের এই পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে নন্দদুলাল রায় চৌধুরী জানাচ্ছেন, 'ওদের সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ অনেক। তাই ওদের অনুকরণ করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই।' (ঘোষ, দেবীপ্রসাদ; বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা; পৃ-৩৭-৩৮) অন্যদিকে চিত্রনাট্য নির্মাতার দর্শন ও মানসিকতাও সাধারণ চরিত্রের দেহে আরোপিত হতে পারে নানা দার্শনিক চেতনা। যেমন একজন নারীবাদী স্রষ্টার উপন্যাস অন্তর্গত নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতাকে, পরিস্থিতির স্বীকার হিসাবে উপস্থাপন করতেই পারেন। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র রূপায়ণের যে পার্থক্য রচিত হয় তার মধ্যে অন্যতম ভোক্তার গ্রহণ করার ক্ষমতাগত পার্থক্য। সাহিত্য নির্মিতই হয় সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী পাঠকগোষ্ঠীর জন্য, আর এই কারণেই চলচ্চিত্র আস্বাদন গোষ্ঠীর পরিধি সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠীর পরিধিকে কাটিয়ে যায়। সেইসঙ্গে সাহিত্যের সমাঝদার পাঠকের স্থানে চলচ্চিত্রের দর্শক আসন দখল করে অনেক আনকোরা দর্শক যাদের হয়তো নুন্যতম সাহিত্যবোধ থাকে না। একজন চিত্রনাট্যকারকে তাদের কথাও মাথায় রেখে তার চিত্রনাট্যটির প্লট নির্মাণ করতে হয়। এপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, -"অগণিত জনসাধারণের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর লেখা-পড়ায় অনুরাগী-যাঁরা পাঠক, গল্প আমাদের শুধু তাদেরই হাতে গিয়ে পড়ে। সাহিত্যের গল্পের রসাগ্রাহী মাত্র ওই মুষ্টিমেয়, 'পাঠকসমাজ'। ছায়াচিত্রের গল্পো রসাগ্রাহী 'দর্শক' গোষ্ঠী কিন্তু তুলনায় উপরোক্ত 'পাঠক' সমাজের অনেক অ-নে-ক বড়ো। বাস্তবে দেখা গেছে শহর আর মফস্বল উভয় ক্ষেত্রেই ছায়াছবির দর্শক এই বৃহত্তর সাধারণের এক বিরাট অংশের পক্ষে সাহিত্যের গল্প পড়া তো দূরের কথা-ওই নিরক্ষর বেচারাদের এমনকি বর্ণ পরিচয়েরও সুযোগ অথবা সৌভাগ্য কোনোটাই ঘটেনি।" (ঘোষ, দেবীপ্রসাদ;

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা; পৃ-৪২-৪৫) ফলত দর্শক রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে চরিত্রের আচরণ, সাজ-পোশাক এ সবই হতে পারে নির্মাতার ইচ্ছানুগ।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রেক্ষাপট থাকলেও ছোটগল্পের কলেবর সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুন একজন চিত্রনাট্যকারের অবকাশ থেকে যায় সেই গল্প কায়াকে অনেকটাই বাড়িয়ে নেওয়ার। যুক্ত হয় নানা অনুঘটনা ও সহকারী চরিত্র। কিন্তু এই কাজটি যে খুব একটি সহজ নয় এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অভিমত-'যে কাহিনি ছবির জন্য বেছে নেওয়া হয় প্রথমেই দেখা দরকার সেটাকে অসম্ভব বিকৃত না করে... উপযোগী করে সাজিয়ে নেওয়া যায় কি না। একটু আধটু পরিবর্তন, অনেকখানি পরিবর্জন এবং হয়তো কিছু পরিবর্ধন না করলে কোনো কাহিনিই চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা যায় না। যদি মনের মতো সাজিয়ে নেওয়ার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য কোনো বাধা থাকে তাহলে সে কাহিনিকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে হবে।" (ঘোষ, দেবীপ্রসাদ; বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা; পৃ-৬৯-৭০) বাংলা কথাসাহিত্য আশ্রিত সফল চিত্রনাট্যের সংখ্যা বাংলায় নেহাত কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখেরবালি', বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরানী', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত্ব মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস সফল চিত্রনাট্যের ঐতিহ্য বহন করে।

আসলে ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর উপন্যাসে, গল্পকার যেমন তাঁর গল্পে কাহিনিকে বিবৃত করেন একজন চিত্রনাট্যকারও তাঁর চলচ্চিত্রে কাহিনিকেই বিবৃত করেন। এ সম্পর্কে Haig P. Manoogain তাঁর 'The Flim Maker's Art' গ্রন্থে বলেছেন- 'Plot is the working out of the story of a flim comprising a causally connceted series of motivated incidents structurs refers to the way in which the events of the plots are ordered and integrated." তবে চিত্রনাট্যকারের এই প্লট উপস্থাপন রীতি আলাদা। 'উপন্যাসের পরিস্থিতি এগিয়ে চলে অধ্যায় বা উপ-অধ্যায় পেরিয়ে পেরিয়ে। নাটকে তার চলন আরও ছোটমাপের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে এক অঙ্ক থেকে অন্য অঙ্কে। চিত্রনাট্য আরও ছোটমাপের একাধিক অনুদৃশ্যের মাঝে থাকে ছেদ বা যতি- মিক্স, ক্লোজ, কাট, ডিজলভ্, লং শট, ফেড আউট ইত্যাদি; কখনও একাধিক পরিস্থিতি একই সঙ্গে কখনও বা পরস্পর বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশা-সৃষ্টি করে এবং সময়ে বিক্ষিপ্ত দ্রুত টুকরো টুকরো হয়।' আর এই কাহিনি বা প্লটের জন্য চলচ্চিত্রকে বারংবার সাহিত্যের কাছে হাত পাততে হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। গোড়ার দিকে তাই সাহিত্যও তো চলচ্চিত্রের ধাত্রীমায়ের মতো কাজ করেছে। সাহিত্যের বুঝেই চলচ্চিত্র লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হয়েছে।

১২.৬ সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচিত্রের ভাষা

মনে রাখার বিষয়, সাহিত্যের যা ভাষাগত ইমেজ, চলচ্চিত্রে তাই দৃশ্য ও শব্দগত ইমেজ। সাহিত্যে যা mental pictorialism চলচ্চিত্রে তা visual pictorialism-এ রূপ পায়। সাহিত্যে এই ইমেজের

অবজেক্টিভ বিচার, শিল্পের অনুভূতিমূলক রূপ কল্পনা আর সিনেমায় সেই ইমেজের সাবজেকটিভ বিচার, শিল্পের আবেগমূলক রূপকল্পনা। এপ্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হিমযুগ' কবিতাটির কথা মনে পড়ে। যেখানে নর-নারীর মিলন সম্পর্কে পাই এভাব—

"শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূরে চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে--
শিশিরে ধুয়েছে বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে—
আমার নিঃশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে সতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।"

---এমন মিলনের বর্ণনাই চিত্রনাট্যকারের বর্ণনায় কীরূপে ধরা দেয় তা গবেষক ধীমান দাশগুপ্তের বই থেকে দেখা যাক---

"আল্যা রণের 'দি ওয়র ইজ ওভার' ছবিতে প্রেমিক-প্রেমিকা তথা পুরুষ-নারীর প্রায় নগ্ন শরীরের ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান করে, ডলি করে, ছন্দশীল জ্যায়ে আন্দোলিত হয়, গতি হ্রাস বা বৃদ্ধি করে। পুরুষ শরীরের খাঁজ ও ভাঁজ আর নারী শরীরের তল ও আকারের (যেমন স্তন বা নিতম্বের পাহাড়, তলপেটের ঢালুভূমি, যোনিদেশের অরণ্য) ক্রমিক বা যৌথ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে মিলনের ভূগোল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে যৌনক্রিয়ার সঙ্গে ক্যামেরা মুভমেন্ট একাত্ম হয়ে যায়, অন্যদিকে শাদা-কালো ফটোগ্রাফি দৃশ্যের ঘনীভূত করে। মিলনের ম্যাজিক, উচ্ছলতা, উন্মাদনা, সপ্রাণতা, দর্শকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। "

সুতরাং এখানে চলচ্চিত্রের ভাষা কাব্য ভাষা থেকে অনেক এক্সট্রোভার্ট। সাহিত্যে যা ছিল ইঙ্গিতময়, সিনেমায় তাই প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করে। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন সাহিত্যের ভাষা থেকে চলচ্চিত্রের ভাষা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। আবার অন্যদিকে চিত্রনাট্যকার তাঁর সৃষ্টির মোটিভ হিসাবে তাঁর সৃষ্ট ভাষাকে অন্য খাতে বইবার সাহস যোগান। কিন্তু এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকার নিষ্ঠুর, কারণ সৃষ্টিটি তাঁর একান্ত নিজস্ব। হতে পারে তা কোন সাহিত্য প্রভাবিত বা সাহিত্য থেকে লেখা কিন্তু তার খোলনচে বদলে দিয়ে দর্শকের মনগ্রাহী করে তোলাই চিত্রনাট্যকারের কাজ। 'সোনার কেল্লা' চিত্রনাট্যটির গল্পটিরও রচয়িতা সত্যজিৎ রায়ই যখন চলচ্চিত্রের জন্য 'সোনার কেল্লা'র চিত্রনাট্যা লিখছেন তখন গল্পের ভাষা থেকে কায়া বদলাতে কিন্তু সত্যজিৎ রায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। যেমন সাহিত্যের ফেলুদা কাহিনিতে যখন মুকুলের সমবয়সী নীলুর সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন বলে 'তোমার হাতে বুঝি ব্যথা পেয়েছ নীলু' কারণ এর মধ্য দিয়ে ফেলুদা তার ভয় কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে দেখা যায় এই

স্থানে ফেলুদা মুকুলকে একটি খেলনা বন্দুক দিয়ে বলে 'দাদু এই দেখ তোমার জন্য কী এনেছি।' মুকুল বন্দুকটি যখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ফেলুদা বললেন, 'গুলি ভরা আছে কিন্তু' ছেলেটা ট্রিগার টিপতেই ফটাস করে একটি শব্দ হল, মুকুলের মুখে তখন একগাল হাসি। এবার ফেলুদার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সে তৈরি। একটি বাচ্চাকে সমবেদনা দেখালে সে যতটা বন্ধু হয়ে ওঠে একটি বড় খেলনা বন্দুক দিলে সে আরো বেশি বন্ধু হয়ে ওঠে। এই প্রত্যক্ষ সত্য যেমন সত্যজিৎ রায় বুঝেছিলেন তেমনি কিন্তু প্রত্যেক চিত্রনাট্যকারের প্রয়োজন এই ব্যবধান বোঝা ও তার যথার্থ প্রয়োগ করা। অন্যদিকে 'অপরাজিত'তে যে অপুকে বিভূতিভূষণ নির্মলার সঙ্গে একটি ভালোবাসার আংশিক রূপ দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রনাট্য তা সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। উপন্যাসের অপুর বন্ধু অনিলের সেই আকাশ-কুসুম উচ্চাশা চিত্রনাট্যে থাকল না। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লীলা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যে বাদ পড়েছে। তিনি নিজের কথায় জানান অপু-সর্বজয়ার ত্রিকোণ কোণ এড়ানোর জন্য লীলাকে বাদ দিয়েছিলেন। আসলে সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্য ছিল এক মা ও তার ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েনকে ফুটিয়ে তোলা, একজন মায়ের প্রতি তার ছেলের উদাসীনতা, আর সেজন্য তিনি যেটুকু প্রয়োজন উপন্যাস থেকে সেটুকুই গ্রহণ করেছেন।

এবার বলা যাক মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকটির কথা যার চিত্রনাট্যরূপ 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এ নাটকের কাহিনি থেকে অনেক আগে এগিয়ে নাটকের ভূত চরিত্র ছকড়ি দত্তের ভূত হবার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনি জুড়ে দেন চিত্রনাট্যকার তপন সিনহা। নাটকে যে গুপিকে মূলত যুবক বয়সের বাউণ্ডুলে চরিত্ররূপে পাই তাকেই চিত্রনাট্যে বাচ্চা বয়েসের তুলনায়, কম বয়েসী বাঞ্ছারামের সঙ্গে দেখা যায়। নাটকে ন'কড়ি দত্তকে যেমন কমিক চরিত্র হিসেবে দেখি চলচ্চিত্রে সে তুলনায় অনেক গম্ভীর। চিত্রনাট্যকার চেয়েছিলেন গম্ভীর না হলে তার চরিত্রের হিংস্রতা প্রকাশ পাবে না। মাসহারা দু'শো টাকার প্রসঙ্গ উঠে গিয়ে চিত্রনাট্যে যোগ হয় ভরণপোষণের দায়িত্ব এবং পরে তা হয় চারশো টাকা। আসলে সময়ের সাপেক্ষে বাঞ্ছারামের ক্রমিক উন্মোচনে দু'শো টাকা অন্তত সিনেমায় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে না বলেই হয়তো চিত্রনাট্যকার তাকে বদলে দেয় ভরণপোষণের দায়িত্বে কিংবা চারশো টাকায়। নাটকের বহু দৃশ্য যেমন চিত্রনাট্যটিতে বাদ পড়েছে তেমনি দৃশ্যগত সংযোজন লক্ষণীয় যেমন মোক্তারের বাঞ্ছারামকে খাবার দিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মনে রাখার বিষয় একজন চিত্রনাট্যকারের কাছে মূল সত্য হল তারাই যাদের জন্য তিনি চিত্রনাট্যটি রচনা করছেন। তাই তাদের কাল ও রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাতে গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে, ভাষাগত রদবদল ঘটিয়ে, সংগীত জুড়ে দিয়ে একটি সার্থক চিত্রনাট্যরূপ গড়ে তুলবেন। এই স্বাধীনতা চিত্রনাট্যকারের প্রাপ্য, শ্রদ্ধেয় পবিত্র সরকারের মতে,-এই স্বাধীনতা চলচ্চিত্রকারকে দিতেই হবে, সাহিত্যের আঁচলের খুঁট ধরে বসিয়ে রাখার বাধ্যতা তার উপর চাপানো উচিত নয়। " বলার অপেক্ষা রাখে না পারস্পরিক যোগ রেখেও যখন চিত্রনাট্যকার স্বতন্ত্র শিল্প নির্মাণের মানসিকতায় সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হন এবং সেখান থেকে কেবল রসদ গ্রহণ করেন সে নির্মাণই শিল্প সার্থকতা পায়।

১২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- চিত্রনাট্য নির্মাণের পেছনে সাহিত্যের ভূমিকা বিষয়ে জানতে পারলাম।
- কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা কীকরে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসাবে নির্মিত হয় তা শিখতে পারলাম।
- সাহিত্যে ভাষা ও চলচ্চিত্রের ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করে তা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারলাম।

১২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মানুষের বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি হচ্ছে চলচ্চিত্র, ঠিক যেমন বিস্ময়কর নির্মাণ সাহিত্য। সাহিত্য যেমন সমাজের চরিত্ররূপকে প্রতিবিম্বিত করে চলচ্চিত্রও তেমনি সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আর এর অন্যতম কারণ বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের আশ্রয় কিন্তু সামগ্রিক মানবিক আবেগ-অনুভূতি।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তৈরি করবেন। (দ্রষ্টব্য ১২.৩ অংশ)

২। নাটক ও চিত্রনাট্য বৈশিষ্ট্যগত ভাবে খুব কাছাকাছি দুটি সাহিত্যিক উপাদান। দুটিরই যোগ অভিনয়ের সঙ্গে। তবে একথা স্বীকার্য যে নাটকের কাছ থেকেই কিন্তু চিত্রনাট্য অভিনয়ের আঙ্গিকগত শিক্ষা নেয়। তবুও বলতে হয় দুটির সম্পর্ক ও চিত্রনাট্যের উপর নাটকের শিল্পগত প্রভাব আরও ব্যাপক ও গভীর। ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ১২.৪ অংশ)

১২.৯ অতিরিক্ত পঠন

- দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৯); সিনেমার অ আ ক খ; কলকাতা : বাণীশিল্প
- দাশগুপ্ত, ধীমান (১৯৯৩); সিনেমার আঙ্গিক; কলকাতা : বাণীশিল্প
- রায়, সত্যজিৎ (২০১৪); বিষয় চলচ্চিত্র; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
- রাউত, সৈকত (২০২৩); প্রসঙ্গ : চিত্রনাট্য; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- সাহা, মানবেন্দ্রনাথ (২০১২); চিত্রনাট্য সাহিত্যের নতুন ভুবন; কলকাতা : প্রতিভাস

১২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. চিত্রনাট্য ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের তুলনা উল্লেখ করুন।

২. নাটকের চলচ্চিত্রায়ন বিষয়ে লিখুন।

৩. কথাসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন বিষয়ে লিখুন।

৪. সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষা প্রভেদ অঙ্কন করুন।

*** *** ***